না সাহিত্যের আখ্যান : নিমসাহিত্যের গল্প বুনন

অভিষেক প্রামানিক

Abstract

Protests and movements often change rulers, but sometimes they cross the boundaries of politics and knock on the door of the cultural world and successfully inform and influence them. Often they find expression in the liberation of literature and consequently in the mindset of the people. It may be the opposition between the political hegemeny and the independence of people's thinking that is at the roots of such literary expression. And in our country, this has been true also in the case in Bengali language and literature. New traditions in Bengali repeatedly denounced and overcame the earlier traditions ; this can be particularly observed in the post-independence period. Since the sixties, we have such movements as the 'Hungry Generation' (1962). 'Shruti' (1965), 'Sastra Birodhi' (1966), 'Nimsahitya' (1970), and 'Chakor Sahitya Birodhita' (1970). Since its inception, literary movements in Bengali and the related magazines were mostly Kolkata-centric. However, 'Nimsahitya' was an exception as this literary movement took place in the suburban industrial city of Durgapur. In this paper, I discuss some short stories which are products of this movement focusing on how it challenges traditional style and structure. Unlike traditional 'market-oriented' literature it stood for 'no literature, bitter literature,' called 'Nimsahitya.' I focus on the beginning, progress and completion of 'Nimsahitya' in the eponymous journal 'Nimsahitya'; particularly, the works of Sudhanshu Sen, a factory-worker in Durgapur, Biman Chattopadhyay, Mrinal Banik, Narsingha Ray, Rabindra Guha and Ajay Nandi Majumder. I discuss in this paper Mrinal Banik's 'Manusmorkotocchob,' 'Bishonno Badur' and Ajay Nandi Majumdar's 'Khun Bonam Atmohotya,' and 'Amanush.' 'Nimsahitya' adds a different tone and flavour to Bengali short story.

Key words : 'literature,' 'movement,' 'nimsahitya,' 'short story'.

অতীত থেকে বর্তমান সময়ের চলার পথে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে তার পরিবর্তনের চিত্রগুলি আমাদের বিশেষভাবে নজরে পড়ে। সময়পথের ধারা এটাই প্রমাণ করে যে গতানুগতিকতা চিরকালীন হয়ে কখনও স্থিরতা লাভ করে না। যা কিছু প্রথাগত এবং স্থবিরতার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য উদগ্রীব, তাকে দুমড়ে–মুচড়ে–ভেঙে তার ওপর নবীনত্ব ও মৌলিকত্বের ধ্বজা উড়িয়েই সভ্যতা এগিয়ে গেছে। সভ্যতায় রাজনৈতিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই এই ভাঙা–গড়া, প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধিতায় নতুনের উচ্চস্বর বেশ জোরালোভাবেই বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। যদিও সেই

উচ্চগ্রামের স্বর কতটা স্থায়ী হয়েছে সেটি প্রশ্নের বিষয়। এ প্রসঙ্গে একথা বলা যেতেই পারে, স্থবিরতা বা প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তাও প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে তার অবস্থান দ্বান্দ্বিক হয়ে পড়ে। প্রতিবাদ, আন্দোলন শাসকের পরিবর্তন করেছে তবে তা রাজনীতির সীমা অতিক্রম করে বহুবার সাংস্কৃতিক জগতের দরজায় কড়া নেড়েছে এবং আপন অস্তিত্বকে সফলভাবে জানান দিয়েছে। আর তার অন্যতম অংশীদার হয়েছে সাহিত্য। আন্দোলন, সাহিত্যের মুক্তাঞ্চলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় আপন রূপমহিমা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রকাশ করেছে। ১৯১০–এর পরবর্তীকালীন মর্ডানিজম, আবার বিংশশতকের গোড়াতেই ঘটে যাওয়া 'দ্য হারলেম রেনেসাঁ', অন্যদিকে ঐ শতকেরই শুরুতে অন্যতম সাহিত্য–সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে উঠে আসে 'ডাডাইজম'–এর নাম আর 'বীট জেনারেশন'–এর নামতো অনেকেরই জানা। এই সাহিত্যিক–সাংস্কৃতিক আন্দোলনও সেই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস সন্ধান করলে লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন দেশের নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মনস্কতা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। হতে পারে রাজনৈতিক শাসকের বিরোধিতা ও স্বাধীনতা মানুষের চিন্তার জগতে আপনমত প্রকাশের মহীরুহ গড়ে তোলার বীজবপন করেছিল। আর আমাদের দেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি।

বাংলা সাহিত্য তার বয়ে চলা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে একাধিকবার ভিন্ন সুরের কথা বলেছে। 'সবুজপত্র', 'কল্লোল' তো তারই প্রমাণ বহন করে। প্রচলিত রীতিকে অস্বীকার করে তারা নতুনত্বের দিক নির্দেশ করেছিল। তবে এই প্রথাভাঙার অনুশীলন স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বেশ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। মূলত ছয়–এর দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে একে একে সাহিত্য আন্দোলনগুলি সংঘটিত হতে থাকে। হাংরি জেনারেশন (১৯৬২ খ্রিঃ), শ্রুতি (১৯৬৫ খ্রিঃ), শাস্ত্রবিরোধী (১৯৬৬ খ্রিঃ), নিমসাহিত্য (১৯৭০ খ্রিঃ), চাকরসাহিত্যবিরোধীতা (১৯৭০ খ্রিঃ) প্রভৃতি বাংলা সাহিত্য আন্দোলনেরই উজ্জ্বল নাম। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, নতুন দেশের নতুন অর্থনীতি, আপনাকে আপনি গড়ে তোলার স্বপ্ন সেই সময় ভারতীয় মানবমনের দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্যে আন্দোলন গড়ে ওঠার গভীরে সেই আকাঙ্ক্ষারই চোরাস্রোত কাজকরেছে বলা যেতে পারে। সমালোচকের কথায় তার সমর্থন মেলে – ''আন্দোলনকারীদের অনেকে পরাধীনতা ও স্বাধীনতা নামক দুই বিপরীত শব্দ ও অভিজ্ঞতাকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড় হওয়া, স্বাধীনতা অর্জন

এবংস্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ – এই তিন অভিজ্ঞতার বিরল সাক্ষী এই সময়ের অনেক লেখক।''[১] অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা সাহিত্যে ও তার স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করতে চেয়েছে। আর একথা অবশ্যই মনে রাখতে হয়, বাংলা ভাষায় সাহিত্য আন্দোলনগুলি সংঘটিত হয়েছে কোনও না কোনও পত্রিকার মাধ্যমে। সূচনালগ্নে বাংলা সাহিত্য আন্দোলন ও তার সম্পর্কিত পত্রিকাগুলি সবই ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সাহিত্য আন্দোলন কলকাতার সীমায়িত বৃত্তের বাইরে সংঘটিত হয়েছিল, সেটি ছিল 'নিমসাহিত্য'। আমাদের আলোচনা এই 'নিমসাহিত্য' ও তার ছোটগল্প নিয়ে। নতুন দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির চিত্র যখন প্রসারিত হচ্ছে তখন প্রতি রাজ্যেই তার রাজধানীর বাইরেও নগরী গড়ে ওঠার পর্ব শুরু হয়েছে সে নগরী শিল্পনগরী। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে কলকাতার থেকে বেশ খানিকটা দূরে, দুর্গাপুরে। নিমসাহিত্যের সূচনা এই নবগঠিত শিল্পনগরী দুর্গাপুরে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ছোঁয়ায় স্বাধীন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রেই ১৯৫৫ সালে দুর্গাপুরে ভারী শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। শ্রমিক–মালিকের সম্পর্কে গড়ে ওঠা নতুন সমাজবিন্যাসে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে যারা রাজধানীর বাইরে নিজেদের চিন্তার জগতে শান দিয়ে আপন অস্তিত্বকে জানান দিতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের নানান দাবী, ভিন্ন মত, চিন্তা নতুনত্বের অঙ্গীকার করে। সাহিত্যেও তার প্রভাব প্রসারিত হয়। যা কিছু শাস্ত্রীয় রীতি মেনে নিয়মের সুতোয় মেপে মেপে সৃষ্ট সাহিত্য, তার রীতি, গঠনশৈলীকে চ্যালেঞ্জ জানায় এই সাহিত্য আন্দোলন। প্রথাগত সাহিত্যকে, 'বাজারমুখী' সাহিত্যকে নাকচ করে গড়ে ওঠে 'নাসাহিত্য, তিক্তসাহিত্য'–এর উদ্যাগ, যার নাম 'নিমসাহিত্য'।

'নিমসাহিত্য' নামের পত্রিকাতেই নিম–সাহিত্যের সূচনা, অগ্রগতি ও পরিসমাপ্তি। 'নিমসাহিত্য'–পত্রিকার মোট তেরোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। যার সূচনা ১৯৭০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে।[২] তেরোটি সংখ্যার মধ্যে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যা তিনটি দুষ্প্রাপ্য বলা চলে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় 'নিমসাহিত্য' পত্রিকার অষ্টম 'বিষ' নামক সংকলন ছাড়া কোনও সংখ্যাতেই পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল না এবং সব ক্ষেত্রেই ডবলডিমাই কাগজে তা প্রকাশিত হয়েছে। কারখানার জীবন, বিংশশতকের ছয় ও সাতের দশকে যখন রাজনৈতিক মিথ্যাচারে জীবন তার

মূল্যবোধকে বারবার প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়াতে দেখেছে তারই প্রকাশ ঘটেছে বিস্ফোরণে, যে বিস্ফোরণ চিন্তাজগতের সেই দ্বারে ধাক্কা দিয়েছে, যে দ্বারের ওপারে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক অবক্ষয়, মানুষের জীবিকা অর্জনের নিত্যচিন্তা সমাজেপ্রতিনিয়ত আলোচিত হয়েছে। তারই প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যের আঙিনায় যা কিছু প্রথাগত তাকে অস্বীকারের মাধ্যমে। তাই দুর্গাপুরের কারখানায় কর্মরত সুধাংশু সেন, বিমান চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল বণিক, নৃসিংহ রায়, রবীন্দ্র গুহ এবং অজয় নন্দী মজুমদার – এই ছয়জনের মিলিত বিপরীতমুখী সাহিত্যধারার মাধ্যমে 'নিমসাহিত্য' তার পথ চলা শুরু করেছিল। এই পথ চলা সাহিত্যে যা কিছু প্রথাগত, সংজ্ঞায়িত সাহিত্য তার বিপরীতে আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। বিপরীতমুখী সাহিত্যধারার বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া যায় রবীন্দ্র গুহের কথায় :

> সময় বদলকরণের ফলে মানুষের আদল বদলায়, মানসিকতা বদলায়। এই বদলে যাওয়া অবস্থা উদ্বাস্তু তথা ছিন্নমূল হওয়া নয়। এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থান তক ইহা এক লজিক্যাল একসটেনশন। যাত্রাপথে বিস্তর কনফিউজড রিয়ালাইজেশন। এহেন মারমুখি রিয়ালিটির রিয়ালাইজেশন থেকেই নিমভাবনা। উনিশশো ষাট–সত্তরের রিয়ালিটি বিমল মিত্র, বিমল কর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রিয়ালিটির সঙ্গে মেলে না। আমরা যারা শিল্পাঞ্চলের প্রোডাক্ট, তাদের রিয়ালিটিবোধের মধ্যেও তারতম্য আছে। গল্পকে যারা থিম মনে করত, আমরা তাদের দলের নই।[৩]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় নিমসাহিত্যের ভীত গড়ে উঠেছে প্রথাগত গল্পের বা বলা ভালো বাজারচলতি গল্পের বিপরীতে, যেখানে তাঁরা চলতি গল্পের অবস্থানকে অস্বীকার করেছেন। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাকেই তাঁরা সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন।

'নিমসাহিত্য' কেমন ছিল? তাঁদের দর্শন কী? এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরসন্ধানে পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু শ্লোগানের দিকে নজর দিলে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর হয়। যেমন– 'লেখক হওয়ার বাসনা জাগা মাত্র আত্মহত্যা করুন', 'জীবন মানেই প্রধানত জীবনের সমস্ত পুঁয রক্ত থুতু ও লালা,' 'সাহিত্য অভিজ্ঞতার ফল নয়, অবিকৃত অভিজ্ঞতাই সাহিত্য,' 'সাহিত্যের ঐতিহ্য বাতিল হয়ে গেছে, জীবনেরও আর কোনও ঐতিহ্য নেই,' 'সাহিত্যে গোপনতা বা চতুরতা বলে কিছু নেই। মূত্রস্থলী টনটন করলে

আমরা দেয়াল বা ঝোপের আড়াল খুঁজিনা,' 'এক হাতে নিজের হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে অন্য হাতে কলম ধরুন,' 'সাহিত্যের অতীত মৃত। এখন আমাদের নিয়ে সাহিত্য আমাদের দ্বারা সাহিত্য,' 'পচনশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলুন – সভ্যতা দীন–দরিদ্রের দ্বারস্থ,' 'কালো চশমা খুলে ফেলুন, সোজাসুজিসূর্যের দিকে তাকান' ইত্যাদি। এই সকল শ্লোগান যা নিমসাহিত্যের 'উবাচ' নামে পরিচিত, সেগুলির দিকে নজর দিলে বোঝা যায়, নিমসাহিত্যিকরা সাহিত্যের পা চাটতে রাজি নন। যা কিছু চলমান ও বাজারি সাহিত্যের মধ্যে পড়ে সেই সমস্ত সৃষ্টিকে তারা সরাসরি নাকচ করেছেন। ঐতিহ্য, কলমপেশা, গোপনতা, অভিজ্ঞতা এসব যখন সাহিত্যের উপাদান হয়েছে সেসবই একলহমায় নিম জেনারেশন ত্যাগ করেছে, শুধু ত্যাগই নয় বরং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আর এই আন্দোলন যে খুব মসৃণ পথে নিজেকে অগ্রসর করতে পেরেছিল এমনটা ভেবে নেওয়া ভুল হবে। কারণ 'নিমসাহিত্য' এর পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত 'ব্যারেলের ওপর থেকে প্রজাপতি উড়িয়ে দিন' – শ্লোগানের জন্য তাদের 'সাহিত্যের নকশাল' তকমাও জুটেছিল এবং তার সঙ্গে পুলিশি ঝামেলা।[৪] যদিও নিমসাহিত্যের সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের সম্পর্ক সে অর্থে নেই। যেহেতু নিম জেনারেশন প্রজাপতির স্নিগ্ধতাকে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে সাহিত্যে মিথ্যা লাবণ্য মনে করে বন্দুকের মতো তীব্রতাকে আহ্বান করেছিল তাই তার 'নকশাল' বিশেষণ প্রাপ্তি ঘটেছে – একথা বলা যেতে পারে। সময় তার চলমানতায় মননশীলতার পরিবর্তন ঘটায়, নিমসাহিত্য, সাহিত্যের উর্বরভূমিতে সেই মননশীলতারই এক সার্থক লালিত চর্চা।

'নিমসাহিত্য'–এ যাঁরা ছোটো গল্প লিখেছেন তাঁরা সকলেই কমবেশি নিম জেনারেশনের গোষ্ঠীভুক্ত, আবার সুনীল গাঙ্গুলীও 'নিমসাহিত্য'–এর ষষ্ঠ সংকলনে লিখেছেন, 'আমার বন্ধু' নামের একটি গল্প। তবে আমাদের আলোচনা মূলত নিমগোষ্ঠীর দুইজন গল্পকার ও তাদের গল্প নিয়ে। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলে নিতে হয়, নিমগল্পকে কোনও সূত্র–নির্ভরতার হিসাবে মাপতে গেলে চলবেনা। গল্পের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা চরিত্রের নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিকতায় নিমসাহিত্য বিশ্বাসী নয়। তার বিপরীতে মনস্তত্ত্বই গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। আসলে অবিকৃত অভিজ্ঞতাই সেখানে সাহিত্য হয়ে উঠেছে, তাই চরিত্র কেবল 'আমি' হয়েই থেকে গেছে। তেমনই একটি গল্প মৃণাল বণিকের লেখা 'মানুষমর্কটচ্ছব'। গল্পটি 'নিমসাহিত্য' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত

হয়েছে। গল্পটিতে স্পষ্টতই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে 'আমি', যে তার অবস্থা ব্যক্ত করেছে মাত্র। যেহেতু নিমসাহিত্যিকরা থিম–ধারনার বিরেধী তাই এ গল্পেও সে অর্থে কোনও থিম নেই। যা আছে তা কেবল একক মানুষের অবস্থান পরিবর্তনের অভিব্যক্তি। 'আমি' তার অবস্থার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন কারখানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজের বাস্তবকে অতি সরলভাবে তুলে ধরেছে যা লেখকের কলমকে নিম–এর কলমের প্রমাণ দাখিল করতে সাহায্য করেছে। উঠে এসেছে মালিক–শ্রমিকের প্রকৃতচিত্র – ''একটাও পয়সা নেই – অথচ অনেক দূর যেতে হবে। হেঁটে যাওয়াও সম্ভব নয়। এবং যেতেই হবে, অথচ পয়সা নেই। কি করে যাব। না গেলেও চলবে না। চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। চিঠিতে কি লেখা আছে জানিনা। জানা সম্ভবও নয়। কারণ আমি পড়তে জানিনা। আর সেজন্যই গোলকবাবু, বাবু গোলকবিহারী সাহা, পাঁচপাঁচটা ধানকল, আলুর গুদাম, কাঠের গোলার মালিক, আমাকে, আমার মতো একটা টমটমকে দিয়ে এই চিঠিটা পাঠাচ্ছে সর্দার হুজুরসিং প্যাটেলের কাছে, যার শুনেছি গোটা পঞ্চাশেক বাস, লরী ইত্যাদি আছে।''[৫] সত্যিই পড়াশোনা জানা থাকলে চিত্র ভিন্ন রকম হত। তবু এই 'টমটম'দের দিয়েই গোলকবাবুদের সম্পত্তি ফুলে ওঠে। তাই 'আমি' গল্পের শেষে বাঁদরকেই নিজের ক্ষমতা দেখানোর সঠিক স্থান অনুমান করতে পারে। গল্পের শুরু পয়সা না থাকা থেকে সমাপ্তি পয়সা আয় করতে সক্ষম বাঁদরের পেছনে লাথিমারাতে। চরিত্র তার অক্ষমতাকে কখন যে বাইরে প্রকাশ করবে তার আশঙ্কায় সমস্ত সম্ভাবনাগুলোকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। তাই বাঁদরকেও কখন যেন নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়েছে। আসলে নিমসাহিত্যে গোপনীয়তার কিছু নেই। তাই বাঁদরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নাচের ইচ্ছা মনে মনে লালন করেছে। মানুষের অবস্থান কোথায় আর তাকে মিথ্যে মোড়কে ঢেকে কোথায় প্রদর্শন করা হয়, এইরকম একটা ভণ্ডামোকে গল্পকার যেন ভেঙে চুরমার করে দিতে চেয়েছেন এই গল্পে। যেখানে মূল চরিত্রে মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের বেকারত্বের বীভৎস ছবি অঙ্কিত হয়েছে। তাই বাঁদর মানুষের অস্তিত্বকে ব্যাঙ্গ করেছে। বাঁদরনাচ দেখিয়ে পয়সা উপায় করতে পারলেও একজন মানুষ অপারগ। নতুন গড়ে ওঠা কারখানাও তার নব্যজাত শ্রমিকের অবস্থান এই গল্পকে সুনিপুণভাবে নিমগল্প করে তুলেছে।

মৃণাল বণিকেরই অপর গল্প যেটি 'নিমসাহিত্য'–এর পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি হল 'বিষণ্ণবাদুড়'। গল্পটিতে মূলচরিত্র নামহীন। এই নামহীন চরিত্রের

এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এবংসেই আকাঙ্ক্ষার বক্তব্যের আকারে প্রকাশেই গল্পের সম্পূর্ণ গঠন। নামহীন কথকের অদ্ভুত ইচ্ছা যে, সে সর্বানী নামে এক নারীর মাড়ি চাটতে চায়। সমস্তরকম সংজ্ঞায়িত সাহিত্যিক বর্ণনার বাইরে গিয়ে এই গল্পের প্রতীক ব্যবহারে আশ্চর্য হতে হয়। তাই যে সর্বানীর মাড়ি কথকের চরম আকাঙ্ক্ষার সেই সর্বানীকে আবিষ্কারে ঘটে – ''পুতুলনাচের আসরে সর্বানীকে আবিষ্কার করার আনন্দে আমি বমিই করে ফেলেছিলাম।''[৬] আনন্দের সঙ্গে বমির যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া এই গল্পের ক্ষেত্রে পাঠকের অনুচিত হবে। কারণ এটি নিমগল্প, যে গল্প ঘোষিতভাবে সমস্ত প্রচলিত গল্পের মিথভাঙার জন্যই লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মূল চরিত্র কথকের ভূমিকা নিয়ে তার মনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বয়ান গল্পটিতে রেকর্ড করেছে। আর সেখানে গল্পকারের লেখনশৈলী, তার উপমা ব্যবহার, ভাষার বিন্যাস প্রচলিত 'গল্প'–এর মুখে যেন অধররসকে থুথু করে ছিটিয়ে দিয়েছে। তাই কারোর স্বাদ, কামনা ও সাফল্যের মাপকাঠি যে সমাজের বৃহদাংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলবে এমনটা নয়। তবু একক মানুষের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক। তারই প্রকাশ – ''তোমার মাড়ি চাটবার সাধ ছিল আমার অপরিসীম। অথচ এই সহজ কথাটা বাকি চারজনকে বলতেই, তারা নাক কুঁচকে, আর্তনাদ করতে করতে দৌড়াল।''[৭] একজনের স্বাভাবিক ভাবনাকে যে সবসময় আর সকলের স্বাভাবিকতায় খাপ খাওয়াতে হবে এমন মাথার দিব্বি কে দিয়েছে? আর দিব্বি দিলেও নিমগল্প তাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে। গল্পে সর্বানীর মাড়ি চাটার সাধ কথকের পূর্ণ হয়নি, শুধু নিজের হাত চেটেই সমগ্র অভিজ্ঞতার কোলাজ সাজাতে হয়েছে :

> সর্বানীর মাড়ি চাটতে পারিনি, তার স্বাদও অজানা, অপূর্ণ। এমন সময় ক্রমাগত পাকদণ্ডী চক্কর এক ভয়ঙ্কর দিনে আমি আমার হাতের শুকনো চেটো চাটতে চাটতে– ১০ মিনিট পর্যন্ত মনে হল – লোনা... ২৩ মিনিটে মনে হল – কোন স্বাদ নেই...। ২৯ মিনিটে কষা... এবং তারপর সর্বক্ষণই অজস্র রক্তের ঢেউ আমার মুখের গহ্বরে। সর্বানী, আমার সর্বানী তোমার মাড়ি চাটবার সাধ ছিল অপরিসীম...।[৮]

এই হাতচাটা অভাবের কারণে কোনও প্রতীক নয়তো এমন প্রশ্নও আমাদের মনে যে একেবারে ওঠেনা এমনটা নয়। তবে খুব স্বল্প পরিসরে রচিত এই গল্পে একটি নামহীন চরিত্রের এক বিচিত্র আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে আশ্চর্য সব উপমা ও অদ্ভুত

রূপকের ব্যবহার ঘটেছে। যেখানে সমস্ত শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করে গল্পের দুনিয়ায় এক তীব্র তিক্ত সাহিত্যরসের বমন ঘটেছে।

নিম জেনারেশনের আর একজন অন্যতম সদস্য ও লেখক হলেন অজয় নন্দী মজুমদার। 'নিম সাহিত্য' সংকলনগুলিতে প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলির মধ্যে একটি বিশেষ গল্প হল 'খুন বনাম আত্মহত্যা'। বিশেষ এই কারণে যে গল্পটিতে কোথাও যেন নিম সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠার সময়ের মানব স্বপ্নের মৃত্যুর শবদেহ কঙ্কালসার হয়ে মৃত্যুকেই বারবার ফিরে পেতে চেয়েছে – এমন একটা বিন্যাস আছে। গল্পটি 'নিম সাহিত্য'–এর নবম সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটিতে কোনও চরিত্রনাম নেই, কেবলমাত্র 'আমি' তার নিজের মনের কথামালাকে বহিঃপ্রকাশ করেছে। এই প্রকাশে মৃত্যু ও খুনের ক্রমপর্যায় নির্মিত হয়েছে, যে পর্যায়ে খুন করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, নেশার মতো পেয়ে বসেছে মনের একমাত্র ইচ্ছা ও চাওয়ার কুঠুরিকে। কিন্তু এই খুন কোনও দৈহিক প্রাণকে অপার্থিব করে দেওয়া নয়। এই গল্পে খুন হয়েছে স্বপ্নের। উত্তম পুরুষ কথক তার স্বপ্নকে খুন করেছে, একবার নয় একাধিকবার। 'স্বপ্ন' আসলে গল্পে প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সময় স্বপ্ন দেখাতে শেখায়, মানবজীবন এই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে তার ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে পা বাড়ায়। তবু বাধা আসে, অনেক ক্ষেত্রে সে বাধা অতিক্রম করে অনেকে স্বপ্ন পূরণে সফল হয়। কিন্তু এখানে সময় স্বপ্ন পূরণের পথে পরিহাস করেছে। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে সাধারণ মানুষ সাধারণত্বকে অতিক্রম করার স্বপ্ন দেখেছে যুগে যুগে। কিন্তু স্বপ্নের কারবারি তাদের স্বপ্নের সঙ্গে খেলেছে, স্বপ্নকে সফল হতে দেয়নি। বিংশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে ঠিক তাই–ই ঘটেছিল। তাই গল্পে একজন পঁচিশ বছর বয়সী যুবককে নিজের স্বপ্নের হন্তারকে পরিণত হতে হয়।

> হ্যাঁ আমি। স্বনির্বাচিত স্বপ্নগুলোকে পাকা খুনীর মতো একটা একটা করে নির্মমভাবে খুন করেছি। বছরের পর বছর কেটে গেছে অনায়াসে। আমি খুন করেছি। ক্লান্ত হইনি আজও। তবে। তবে আমার এখন এই মুহূর্তে এবংএখন থেকে প্রতি মুহূর্তে আমার বড় অভাব। খুন করার মতো আমার আর স্বপ্ন নেই। কিন্তু আমার নেশা? আমার খুনের নেশা আমাকে পাগল করেছে। খুন আমাকে করতেই হবে। আমার স্বপ্ন চাই। স্বপ্ন চাই। স্বপ্ন চাই। আমি কাকে খুন করব? খুন যে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু? কিন্তু আমার স্বপ্ন কোথায়। এই পঁচিশ বছরেই আমার সব স্বপ্ন ফুরিয়ে গেল?[৯]

হ্যাঁ পঁচিশ বছরের যুব সম্প্রদায়ের সমস্ত স্বপ্ন তখন ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য লাইন দিয়েছিল। এই স্বপ্ন ছিল সমাজের মধ্যে আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার, একটা রুজিরুটি জোগাড়ের স্বপ্ন কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের সমাজে একার স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে যায় পরিবারের স্বপ্ন। পরিস্থিতির শিকার হয়ে সব সময় চলে এসেছে স্বপ্নের মৃত্যু। তাই ছেলেকে নিয়ে বাবার স্বপ্ন, মা–এর স্বপ্ন বা দাদাকে নিয়ে বোনের স্বপ্নগুলোকে খুন করতে হয়। খুন করতে বাধ্য করেছে সময়। সেই সময় স্বপ্নের ডালি সাজানো থাকলেও সেখানে শুধু ধোঁকা পাওয়া গেছে। তাই নিজের স্বপ্নের হত্যাকারী দালালদের হুঁশিয়ারি দিতে ভুলে যায়নি :

> আমার পারিপার্শ্বিক আমার সমাজব্যবস্থা এই সবকিছু আমাকে খুনী তৈরি করেছে। কাজেই খুন আমি চালিয়ে যাবই। যে ভাবেই হোক। যে করেই হোক। আর? আর আমার স্বনির্বাচিত স্বপ্নকে যখন আমি হত্যা করতে পেরেছি তখন ভয় কিসের? আমার স্বপ্ন নিঃশেষ। কিন্তু? কিন্তু আর যারা পলাতক দোস্ত, কিম্বা যারা আমাকে আমার স্বপ্নকে হত্যা করতে শিখিয়েছে অথবা যে বা যারা প্রতিটি দামি স্বপ্নকে অত্যন্ত মমতায় আগলে রেখে লালন–পালন করছে আমাকে এবংআমার আর সব দোস্তদের খুনের রাস্তায় ঠেলে দিয়ে? তারা? তাদের স্বপ্নকে এবার আমি হত্যা করব একই ভাবে। একই নিপুণতায়।[১০]

তাই গল্প শেষ হয় রঙিন স্বপ্নের আড়তদারদের সাবধান করে দিয়ে। এ গল্প নিম আন্দোলনের সময়কে, সময়ের চরম সত্যকে প্রকাশ করেছে।

অজয় নন্দী মজুমদারেরই অপর একটি গল্প 'অ–মানুষ' আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হল। গল্পটি 'নিম সাহিত্য' এর চতুর্থ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। 'খুন বনাম আত্মহত্যা'র থেকে এই গল্পটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের বলেই অনুমিত হয়। চরিত্র, প্লট এসবের নিয়ম নিম জেনারেশন মানতে চায়নি বরং তার উল্টো পথে হেঁটে সেগুলোকে অস্বীকার করেছে বারবার। এই গল্পটির ক্ষেত্রেও তা–ই ঘটেছে। গল্পটিতে কোনও চরিত্রের উপস্থিতি সেই অর্থে নেই। কেবল উত্তম পুরুষ কথক তার বাক্য বিন্যাসে গল্পটি বলেছে। গল্পের সূচনায় আছে ঘুম থেকে উঠে সকালের দৃশ্য যেখানে আগের রাতের খাওয়ার কথা আছে। আর সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে মাছ, মাছের প্রতি প্রীতি। মাছের কথায় গল্পকার ভিন্ন ও প্রায় বিপরীতমুখী সম্পর্কের শব্দ চয়ন করেছেন –''দেখতে দেখতে মাছগুলো কখনও মোষের মতো সাদা– বকের মতো কালো – রক্তের মতো

হলদে আর সর্ষে ফুলের মতো লাল হচ্ছিল।''[১১] এখানে 'মোষের মতো সাদা' বা 'বকের মতো কালো' উপমাগুলো কি প্রচলিত ধারণা ও বাস্তবের প্রতি বিদ্রোহ নয়? উত্তরে বলা যেতে পারে এ বিদ্রোহ 'না সাহিত্য' আন্দোলনেরই প্রকাশ। কথক মাছ ভালোবাসেন। মাছ দেখতে ভালোবাসেন, তাই মাছের বাজারে যান। কথকের জবানীতে গল্পকার মাছেরই ফিরিস্তি দিয়েছেন। নিম সাহিত্য গোষ্ঠী অভিজ্ঞতার অবিকৃত বর্ণনায় বিশ্বাস করতেন। তাই গল্পে লিপিবদ্ধ হয় – ''মাছের বাজারে ঢুকতেই 'কুচো চিংড়ি' আর 'মৌরলা'র গাদাগাদি সহাবস্থানে ময়দানের জমায়েতের কথা মনে পড়ে, – 'ভেতকি মাছ'কে দেখলেই মনে পড়ে গুরু নিতম্বিনী গর্ভিনী মহিলার কথা – আবার 'গলদা চিংড়ি' আমার মন কাড়ে –মনে পড়ে বাবার কথা।''[১২] এই বর্ণনা কলমের বন্ধনহীন লিপিমালা। কারণ নিম জেনারেশন চশমা খুলে সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাতে বলেছে। তারা বেশি সাজানো গোছানোয় বিশ্বাসী নয়। গল্পে এর পর দেখা যায় মাছ শিকারের দৃশ্য, সেখানে কথকের সঙ্গী হয়ে 'সাহেবের বাচ্চা'। এখান থেকেই হঠাৎ যেন গল্পের পথ পরিবর্তন। মাছ শিকারে গিয়ে তাড়া খেয়ে পালানোর সময় অদ্ভুতভাবে ব্যবহৃত হয় সিংহের কথা। আর মনে আসে সিংহের মাছ হয়ে যাওয়ার কথা। গল্পের শুরুতে আছে 'আয়না'র প্রতীক যে আয়না মানব মনের জটিলতার চিত্রগ্রাহক। আর গল্প শেষ হয় এই মনেরই ইচ্ছে কক্ষের বক্রপথে। সে পথে মানুষ হয়ে যায় 'অ–মানুষ'।

বিমান চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> নিমসাহিত্য কোনও তথাকথিত সাহিত্য বা নাদুসাহিত্য নয়। নিমসাহিত্য একটা জীবন্ত মনুষ্য শরীরে জীবনযাপনের, সেই শরীরের মুহুর্মুহু মানসিক অবস্থানের, সেই শরীরের বিচিত্র এবংনানা অনুভূতির, সেই শরীরজাত সুস্থ প্রমাণ, বাণীরূপ, গর্জন, হুংকার, হাসি–কান্না–যন্ত্রণার এক একটি উলঙ্গ উচ্চারণ। এমন উচ্চারণে শব্দ ব্যবহার বা ভাষা এক স্বাধীন মুক্তাঞ্চলের অধিবাসী।[১৩]

নিমসাহিত্য তথা গল্প চিন্তার মুক্তাঞ্চলের সৃজন। নব্য গড়ে ওঠা শিল্প শহরের যে ছয় যুবক সাহিত্যে তাঁদের প্রতিবাদী আন্দোলনকে ভাষা দিতে চেয়েছিল, তাঁদের সে আন্দোলন কতটা সফল হয়েছিল? উত্তর সফলতাও তো প্রতিষ্ঠানকেই আমন্ত্রণ জানায় তাই সফলতার মাপকাঠি দূরে সরিয়ে রেখেই বলতে হয়, নিমগল্প বাংলা গল্পে একেবারে ভিন্ন সুর যোগ করেছে। এই সুর শ্রোতার কাছে পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকে না কেবল নিজেপ্রকাশ হতে চায় অবিরাম ধারায়। আর সে ধারায় মৃণাল বণিক ও অজয় নন্দী

মজুমদার উল্লেখযোগ্য নাম।

তথ্যসূত্র :

১। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমআন্দোলন, (দ্র.) সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), ''নিমসাহিত্য'', (কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৭), পৃ. ১৩।
২। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমআন্দোলন, পৃ. ১৭।
৩। রবীন্দ্র গুহ, নিমবেত্তান্ত (হাওড়া : কবিতা ক্যাম্পাস, ২০০৫), পৃ. ৯।
৪। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমআন্দোলন (দ্র.), পৃ. ২৩।
৫। মৃণাল বণিক, মানুষমর্কটচ্ছব, 'নিমসাহিত্য' (পত্রিকা), প্রথম সংকলন।
৬। মৃণাল বণিক, বিষণ্ণবাদুড়, 'নিমসাহিত্য' (পত্রিকা), পঞ্চম সংকলন।
৭। মৃণাল বণিক, বিষণ্ণবাদুড়, 'নিমসাহিত্য'।
৮। মৃণাল বণিক, বিষণ্ণবাদুড়, 'নিমসাহিত্য'।
৯। অজয় নন্দী মজুমদার, খুন বনাম আত্মহত্যা, 'নিমসাহিত্য' (পত্রিকা), নবম সংকলন।
১০। অজয় নন্দী মজুমদার, খুন বনাম আত্মহত্যা, 'নিমসাহিত্য'।
১১। অজয় নন্দী মজুমদার, অ-মানুষ, 'নিমসাহিত্য' (পত্রিকা), চতুর্থ সংকলন।
১২। অজয় নন্দী মজুমদার, অ-মানুষ, 'নিমসাহিত্য'।
১৩। বিমান চট্টোপাধ্যায়, নিমসাহিত্য কী ও কেন (দ্র.), সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), ''নিমসাহিত্য'', (কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৭), পৃ. ৩৮৪।